Vol. 36 | No. 1 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ

Volume	36
Issue	1
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া
Published online	October 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v36i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i1.2
Pages	৪৫-৬৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া

এক

রবীন্দ্রনাথের *বউঠাকুরানীর হাট*[১] এবং *রাজর্ষি*[২] ইতিহাসের উপাদান-নির্ভর রচনা। উপন্যাস দুখানি কিছুটা সমকালীন ঐতিহাসিক উপন্যাসসমূহের আদলে রচিত হলেও অনেকটাই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। তিনি, বস্তুত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যকে বিদায় দিয়েছিলেন: 'his historical romance bid adiew to the tradition established by Bankim'.[৩] এ-দুটি গ্রন্থ রচনার আগেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র এবং প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (১৮?-১৯২১)-এর কোন কোন রচনা পাঠ করেছিলেন। প্রতাপচন্দ্রের *বঙ্গাধিপ পরাজয়* (১ম খণ্ড ১৮৬৯, ২য় ১৮৮৪) বালক-কবি দিনের পর দিন বৌঠানকে পড়ে শুনিয়েছিলেন।[৪] বইটি বৌঠানের ভালো লেগেছিল[৫] এবং কবিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রেরণা দিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অর্ধ-ঐতিহাসিক রোমান্স *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *রাজসিংহ* (১৮৮১) যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস, কিন্তু কোন গ্রন্থেই বাংলাদেশ পটভূমি হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশ এলেও বাঙালি আসেনি। *আনন্দমঠ* (১৮৮২)- ও তাই।[৬]

দুই

এই পরিপ্রেক্ষিতে, রবীন্দ্রনাথের মনে বাংলাদেশকে পটভূমি করে উপন্যাস রচনার সংকল্প জাগে। এবং তিনি প্রতাপাদিত্যের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস

রচনার প্রয়াস পান। উপন্যাস হিসেবে সম্পূর্ণ সফল না হলেও *বউঠাকুরানীর হাট* গ্রন্থে বাংলাদেশের গ্রাম ও গ্রামবাসী নরনারীর যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা' বাস্তব।[৭] তিনি প্রতাপচন্দ্র ঘোষকে অনুসরণ করলেও সমকালীন সমালোচক তাঁকে 'talented author of Bauthakuranir Hat'-বলে উল্লেখ করেন।[৮] সমসাময়িক মুসলিম ঔপন্যাসিকগণ প্রতাপাদিত্যের বিদ্রোহকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে উল্লেখ করেননি।[৯] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অবজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং সে উপাদানের ভিত্তিতে *বউঠাকুরানীর হাট* উপন্যাস রচনা করেছিলেন। *শ্রীরাজমালা* নামক ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে:

> প্রতাপাদিত্যের পূর্বনাম গোপীনাথ, পিতার নাম শ্রীহরি। পাঠান শাসনকর্তা সুলেমানের নিকট হইতে জমিদারী লাভ করিয়া শ্রীহরির উন্নতির আরম্ভ। টোডরমল্লের সহায়তায় আকবর বাদশাহ ইঁহাকে মহারাজ উপাধি দান করেন। তখন শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া মোগলের সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হন (১৫৫৭ খ্রি.)। তিনি স্বীয় পুত্র গোপীনাথকে যুবরাজ করিয়া প্রতাপাদিত্য নাম প্রদান করেন।[১০]

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, মুঘল রাজত্বকালে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চল অল্প-স্বল্প সাময়িক স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। প্রতাপাদিত্য সম্ভবত এদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিলেন। ইতিহাসের সেই ক্ষীণ সূত্র আলোচ্য গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে। সে পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার কিছু তথ্য প্রদান করেছেন:

> বাখরগঞ্জ জেলা মুঘল যুগে সরকার-বাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, তৎপূর্বে এই অঞ্চলের নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ। এখনো সরকারী কাগজপত্রে এই পরগণার নাম বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ। দনুজমর্দন দেবের গুরু চন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নামানুসারে এই স্থানের নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ। দনুজমর্দন দেবের বংশের পুরুষ শাখা লুপ্ত হইলে কালে কন্যাবংশীয় বসুশাখায় রাজাধিকার বর্তায়। এই বংশের কন্দর্পনারায়ণ মগদের দৌরাত্ম্যে উপদ্রুত হইয়া কচুয়া ত্যাগ করিয়া মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করেন। মাধবপাশা বরিশাল হইতে সাত মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত প্রসিদ্ধ গ্রাম।
>
> কন্দর্পনারায়ণ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। তাঁহার মৃত্যুর পর নাবালক রামচন্দ্র রাজা হন। জেসুইট পাদরী ফনসেল প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর যাইবার পথে বাকলায় বালক-রাজা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ফনসেল ইহাকে অমায়িক ও বুদ্ধিমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এই রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিমলার বিবাহ হয়, বিবাহের রাতে শ্বশুর ও জামাই-এর মধ্যে মনোমালিন্য হইলে রামচন্দ্র বধূকে নিজ গ্রামে লইয়া যান নাই। বহুকাল পরে প্রতাপাদিত্যের অনুমতি লইয়া বিমলা অনেকগুলি নৌকায় পিত্রালয়ের বহুবিধ উপহার লইয়া স্বামীর রাজধানী যাত্রা

করেন, মাধবপাশার নিকট ঘাটে তিনি নৌকা বাঁধিলেন। আশা করিয়াছিলেন সংবাদ পাইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে লইয়া আসিবেন। কিন্তু রামচন্দ্র আসিলেন না, এদিকে রানীকে দেখিবার জন্য রাজ্যের নানাস্থান হইতে প্রজার দল আসিতে লাগিল। দরিদ্র ও ভিক্ষুকগণ বিমলার নিকট বহু অর্থ পাইল, ক্রমে সেইস্থানে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া হাট বসিতে লাগিল এবং ইহাই 'বউঠাকুরানীর হাট' নামে পরিবর্তিত হইল। এইরূপ বহুদিন অতিবাহিত হইলে রামচন্দ্র আসিয়া পত্নীকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন।[১১]

ইতিহাসের এই ক্ষীণ সূত্র রবীন্দ্রনাথ *বউঠাকুরানীর হাট* নামক 'নবেল' রচনায় ব্যবহার করেছেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে জেমস ওয়াইজ বাংলার বারভূঁইয়াদের বিষয়ে যে সমীক্ষা করেন সেখানে প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গ নেই, আছে চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের বিবরণ।[১২] রবীন্দ্রনাথ কাহিনীকে কল্পনার রঙে নিজের মত করে পুর্নবিন্যাস করেছেন। ইতিহাসের সাজে তিনি 'বাঙালির ঘরের কথাকে মনের মত করে রূপ দিতে' চেয়েছিলেন।[১৩]

যশোহর-রাজা প্রতাপাদিত্য মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার না করে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতে আরম্ভ করেন। সময়টি ছিল সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল। তখন ভারতের বহু হিন্দু রাজা মুঘলমিত্র হয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায় মুঘলদের মিত্রতা চেয়েছিলেন। ফলে ভ্রাতষ্পুত্র ও খুল্লতাতের মধ্যে মতিবরোধ ঘটে। প্রতাপ পিতৃব্যের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য এবং কন্যা বিভা বসন্ত রায়ের অনুরক্ত ছিল।

উদয় যৌবনে রুক্মিনী নাম্নী এক নারীকে ভালবাসেন। সেই নারী উদয়-পত্নী সুরমাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। বিভার বিয়ে হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে। রামচন্দ্রের প্রতি বিক্ষুব্ধ প্রতাপাদিত্য তাঁকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। উদয়াদিত্যের কৌশলে রামচন্দ্র শ্বশুরের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেয়ে পলায়ন করেন। ভগ্নীপতিকে বাঁচাতে গিয়ে উদয় পিতার ক্রোধে পতিত হন এবং কারারুদ্ধ হন। খুল্লতাত বসন্তরায়ের চেষ্টায় উদয়াদিত্য রক্ষা পান এবং আশ্রয় গ্রহণ করেন বসন্ত রায়ের নিকট। এবার প্রতাপাদিত্য সৈন্য পাঠিয়ে পুত্র উদয়কে বন্দী করেন।

প্রতাপাদিত্য-নিযুক্ত জনৈক মুসলমান ঘাতকদ্বারা বসন্তরায় নিহত হন। উদয়াদিত্য পিতার নিকট রাজ্য ত্যাগের অঙ্গীকার করে কাশী যাত্রা করেন। বিভাকে স্বামীর নিকট পৌছে দিবেন বলে সঙ্গে নিয়েছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের ঘাটে পৌছে উদয় জানতে পারেন যে, রামচন্দ্র শ্বশুরের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় বিয়ে করেছেন। বিভাকে তিনি গ্রহণ করলেন না। ফলে উদয় বিভাকে নিয়েই

কাশী যাত্রা করেন। চন্দ্রদ্বীপের যে-স্থানে বিভার নৌকা বাঁধা হয়েছিল সেই স্থানের নাম হয় বউঠাকুরানীর হাট। ইতিহাসের পূর্বোক্ত তথ্যাদি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাহিনীকে এ-ভাবে পুনর্বিন্যাস করেছেন।

এ উপন্যাসে মুসলমান-প্রসঙ্গ ব্যাপকভাবে আসেনি তবে যতটুকু এসেছে তা গুরুত্বপূর্ণ: প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বরের প্রতি ক্রুদ্ধ, তাঁর মধ্যে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসনের 'ঔদ্ধত্য' জেগেছে। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য'। বইয়ের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, 'স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীর চরিত্র হিসেবে খাড়া করার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিলনা। সেসময়কার ইতিহাস লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানেব প্রভাব ছিলনা। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।'[১৪]

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের *বঙ্গাধিপ পরাজয়* গ্রন্থের প্রভাব *বউঠাকুরানীর হাট* উপন্যাসে আছে। এ কাহিনী সমালোচকের ভাষায় 'different incidents of the same story' অর্থাৎ একই কাহিনীর অনুবর্তন। কিন্তু একটি পার্থক্য এতদুভয়ের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে: প্রতাপচন্দ্র 'মধ্যযুগের বাংলার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র' অংকনের চেষ্টা করলেও তাতে 'সমগ্রের ছবি ফুটেনি' অথচ রবীন্দ্রনাথের নবীন লেখনী বাংলাদেশের গ্রামের ও গ্রামবাসী নর-নারীর যে-চিত্র এঁকেছে তা 'আশ্চর্য' বলতে হবে।[১৫] আর যে কারণে এ সমগ্রতা মূল্যবহ তা হলো মুসলিম প্রসঙ্গের নিরপেক্ষ উপস্থাপনা।

বসন্ত রায়কে হত্যা করানোর দুটি প্রত্যক্ষ কারণ লক্ষ করা যায়—১. বসন্ত রায়ের দিল্লীশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, ২. পিতৃ ইচ্ছা অমান্যকারী পুত্র উদয়াদিত্যকে প্রশ্রয় দান। কিন্তু এতে প্রাণদণ্ড দানের কি একান্ত প্রয়োজন ছিল? আর এই দণ্ড কার্যকর করণ মুসলমান দ্বারা কেন? কল্পনাপ্রিয় লেখকের এই প্রয়াসকে আজ সমালোচনা করেই বা লাভ কি? ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসে এমন প্রাণদণ্ড আর হত্যাকাণ্ড অবাস্তব নয়।

বসন্ত রায়ের স্নেহাশ্রয়ে উদয়াদিত্য বসবাস করছিলেন রায়গড়ে। একদিন সন্ধ্যাকালে যখন উদয় প্রাসাদের বাইরে ভ্রমণ করছিলেন তখন, 'দুইজন সৈন্য মশাল হাতে করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে আর

অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন মুক্তিয়ার খাঁ সম্মুখে আসিয়া যুবরাজকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার খাঁ, কী খবর?" "মুক্তিয়ার খাঁ বিনীতভাবে কহিল, "জনাব, আমাদের মহারাজের নিকট হইতে আদেশ লইয়া আসিতেছি।"[১৬]

'সে আদেশ কি ছিল', যুবরাজ উদয়াদিত্য জিজ্ঞাসা করলেন। সেনাপতি মুক্তিয়ার খাঁ জানালেন যে, সে আদেশ রায়গড়ের রাজা বসন্ত রায়ের প্রাণদণ্ডের হুকুম। যুবরাজ তার কথাকে 'মিথ্যা' বলে অভিহিত করলে মুক্তিয়ার খাঁ তাঁকে বুঝিয়ে বলে যে, 'মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করেছেন। এ আদেশ যুবরাজকে ব্যথিত করল। তিনি বললেন এমন পুণ্যাত্মাকে বধ করলে নরকেও তোমার স্থান হবে না। সেনাপতি বলল, 'মনিবের আদেশ পালন করিতে পাপ নাই।' মুক্তিয়ার খাঁ তার প্রভু প্রতাপাদিত্যের আদেশ পালন করল। অন্তিমকাল সমাগত বিবেচনা করে বসন্ত রায় তাঁর ইষ্ট দেবতার নিকট ভূমিষ্ট হয়ে মালা জপ করতে করতে মুক্তিয়ারকে প্রভুর আদেশ পালনে সাহায্য করলেন। মুক্তিয়ার খাঁ জনৈক আবদুলকে আদেশ করলো বসন্ত রায়কে হত্যা করতে। বসন্ত রায়কে হত্যা করে উদয়াদিত্যকে নিয়ে মুক্তিয়ার খাঁ ফিরে গেল রাজধানী যশোহর।

বউঠাকুরানীর হাট গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূল ঘটনার আভাস পাওয়া যায়: প্রতাপাদিত্য স্বীয় পিতৃব্য রায়গড়ের রাজা বসন্ত রায়কে হত্যা করবার গোপন আদেশ দিয়ে মন্ত্রীকে তার ব্যবস্থা করতে বলেন। এ-আদেশের পক্ষে প্রতাপাদিত্যের অভিমত:

> আমি যখন নিজ পিতৃব্যকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন অবশ্য তোমার চেয়ে ঢের বেশি ভাবিয়াছি। এ কাজে অধর্ম নাই। আমার ব্রত এই—এই যে ম্লেচ্ছরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন আর্যধর্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, ক্ষত্রিয়েরা মোগলকে কন্যা দিতেছে, হিন্দুরা আচার ভ্রষ্ট হইতেছে, এই ম্লেচ্ছদের আমি দূর করিয়া দিব, আমাদের আর্যধর্মকে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিব। এই ব্রতসাধন করিতে অনেক বলের আবশ্যক। আমি চাই সমস্ত বঙ্গদেশের রাজারা আমার অধীনে এক হয়, যাহারা যবনের মিত্র তাহাদের বিনাশ না করিলে ইহা সিদ্ধ হইবেনা। পিতৃব্য বসন্ত রায় আমার পূজ্যপাদ, কিন্তু যথার্থ বলিতে পাপ নাই তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এমন লোকের সহিত প্রতাপাদিত্যের কোন সম্পর্ক নাই।[১৭]

এই বক্তব্য আপাতত বঙ্কিমকণ্ঠ থেকে নিঃসৃত বলে মনে হতে পারে কিন্তু প্রতাপাদিত্য *আনন্দমঠ*-এর সন্তান বা সন্ন্যাসী নয়। তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের

শ্রদ্ধা নেই—তাকে তিনি উনিশ শতকের নবজাগরণের কোন বীর-প্রতীক বলে মনে করেন না বরং মনে করেন প্রতাপাদিত্য 'উদ্ধত অত্যাচারী, নিষ্ঠুর'। তাই তার মুখ থেকে ম্লেচ্ছদের দেশ থেকে দূর করে দেবার ব্রত, আর্যধর্মকে রাহুগ্রাসমুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা, যবন-মিত্রদের বিনাশ করবার শপথ অবশ্যি অশুভ পরিকল্পনা। তাই বসন্ত রায়কে হত্যা করা শুধু নির্মমতাই নয়, শান্তি ও সহঅবস্থানের প্রতিও হুমকি। প্রতাপাদিত্যকে যারা বীরপুজা দান করেছে তাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অখুসি ছিলেন। যবন-বিতাড়ন উনিশ-শতকী হিন্দু জাতীয়তাবাদের ঔদ্ধত্য—জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রশ্রয়। রবীন্দ্র-ভাবনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত—উপর্যুক্ত বক্তব্যটি যবন বিদ্বেষীদের প্রতি বিদ্রুপ বলেই মনে হয়। আর্যধর্ম রক্ষার অজুহাতে বসন্ত রায়কে হত্যার আদেশ কার্যকরী করতে মন্ত্রী দ্বিধাগ্রস্ত, কারণ: দিল্লীশ্বর এ সংবাদ শুনলে রুষ্ট হবেন (পৃ.৩৮১)।

মন্ত্রী দিল্লীশ্বরের নাম করলে প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'মন্ত্রী, যতবার তুমি দিল্লীশ্বরের নাম কর ততবার যদি জগদীশ্বরের নাম করিতে তাহা হইলে পরকালের কাজ গুছাইতে পারিতে'। (পৃ.৩৮২) প্রতাপ দিল্লীশ্বরের সঙ্গে বেয়াদবি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, 'আমিই দিল্লীশ্বরের বিচারকর্তা, আমিই তাহার দণ্ডের উদ্‌যোগ করিতেছি।' (পৃ.৩৮৩-৮৪)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৮-১৯২৫) নাটক এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস কবি পাঠ করেছিলেন এবং তার বক্তব্যও তিনি অনুধাবন করেছিলেন। নেড়ে, যবন, ম্লেচ্ছ এ সব শব্দ সেকালে কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হতো তা' সর্বজনবিদিত, এ নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পঙ্ক ঘুলিয়ে তোলার শামিল। পাঠানকে দিয়ে প্রতাপ বসন্ত রায়কে হত্যা করিয়েছিলেন—এটা মহারাজের ষড়যন্ত্র ও জিঘাংসার পরিচয়, পাঠানের মনোভাব লেখক ব্যক্ত করেছেন:

> পাঠান সহসা বলিয়া উঠিল, 'হুজুর আশ্বাস পাই তো একটা কথা বলি, আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা। মহারাজ আমাকে ও আমার ভাইকে আদেশ করেন যে, আপনি যখন যশোরের মুখে আসিবেন, তখন পথে আপনাকে খুন করা হয়।' (র-র ১,পৃ.৩৯১)। 'কিন্তু মহারাজ যদিও রাজার আদেশ তথাপি এমন কাজে আমার প্রবৃত্তি হইলনা।'

পাঠানের এ হেন মানবিক আচরণ লক্ষ করে বসন্ত রায় তাকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, রায়গড়ে ফিরে গিয়ে তাকে একটি কাজ দিবেন। লক্ষণীয় যে, সাধারণ মানুষ সহজে অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছে না। কিন্তু সেনাপতি

রাজাদেশ পালনের জন্য নরহত্যাও করতে পেরেছে। জানিনা সাধারণ প্রজা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ ধারণা বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত কি না। রাজত্ব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী সেনাপতিরা জঘন্য পাপ কাজ করে থাকে কিন্তু সাধারণ প্রজা তার ব্যতিক্রম।

উপন্যাসের সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় অস্তমান সূর্যের দিকে চেয়ে বসন্ত রায় আপন মনে গুণগুণ করে গান করছিলেন। 'এমন সময় খাঁ সাহেব আসিয়া এক মস্ত সেলাম করিল। খাঁ সাহেবকে দেখিয়া বসন্ত রায় উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন, "খাঁ সাহেব এসো এসো।" অধিকতর নিকটে গিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, "সাহেব তোমার মুখ অমন মলিন দেখিতেছি কেন? মেজাজ ভাল আছে তো?" খাঁ সাহেব। মেজাজের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, মহারাজ! আপনাকে মলিন দেখিয়া আমাদের মনে আর সুখ নাই। একটি বয়েত আছে—রাত্রি বলে আমি কেহ নই, যাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি সেই চাঁদ, তাহারই সহিত আমি একত্রে হাসি, একত্রে ম্লান হইয়া যাই। মহারাজ আমরাই বা কে, আপনি না হাসিলে আমাদের হাসিবার ক্ষমতা কী? আমাদের আর সুখ নাই, জনাব।

বসন্ত রায় ব্যগ্র হয়ে কহিলেন, "সে কি কথা সাহেব? আমার তো অসুখ কিছুই নাই, আমি নিজেকে দেখিয়া নিজে হাসি, নিজের আনন্দে নিজে থাকি, আমার অসুখ কী খাঁ সাহেব?' [১৮]

খাঁ সাহেব। এখন আর তেমন গান বাদ্য শুনা যায় না। বসন্ত রায় ঈষৎ হাসিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আমার গান শুনিবে সাহেব?" —

আমি শুধু রইনু বাকি
যা ছিল তা গেল চলে,
রইল যা তা কেবল ফাঁকি।

বসন্ত রায় খাঁ সাহেবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপের এক পর্যায়ে বললেন যে, তাঁর সেতারের তার ছিঁড়ে গেছে বলেই আর তিনি সেতার বাজান না। তাতে সুর মেলেনা। উভয়েই সঙ্গীত শিল্পী। খাঁ সাহেব যথার্থ অর্থে ইতিহাসের চরিত্র নয়। তবে বসন্ত রায় অনৈতিহাসিক ব্যক্তি নন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বসন্ত-চরিত্র অংকন করেছেন, তিনি রাজনৈতিক জটিলতা এবং সংসারের হিংসা বিদ্বেষের সঙ্গে নিজকে না জড়িয়েও হিংসা জটিলতা থেকে পরিত্রাণ পাননি। বসন্তের মধ্যে এক মধুর হৃদয় সংবাদী স্বভাব আছে। ইতিহাস নয়, মানবরস এ চরিত্রের প্রধান গুণ। মহারাজা বসন্ত রায়ের হৃদয় ছিল গানের সুরে তাজা। তিনি খাঁ সাহেবের গান শুনতে চাইলে—তারই ফরমায়েসী 'তাজবে তাজ নওবে নও' ধুয়া তিনি বারবার গেয়ে চলেন। এ সঙ্গে তাল

দেন বসন্ত রায় নিজে। (পৃ.৪৮১)। বসন্ত রায় যথার্থ বৈষ্ণব, রাজর্ষি। রবীন্দ্রনাথ তাকে পদকর্তা বসন্ত রায়-এর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন।[১৯] এ কারণেই বোধ করি তাঁর মধ্যে নেই জাত-পাতের সংকীর্ণতা, নেই হিংসা ও স্বার্থপরতা। এই বসন্ত রায়কে হত্যা করতে গিয়ে হোসেন খাঁ বলে, 'তোবা, তোবা এমন কাজও করে! কাফেরকে মারিলে পুণ্য আছে বটে কিন্তু সে পুণ্য এত উপার্জন করিয়াছি যে, পরকালের বিষয়ে আর বড়ো ভাবনা নাই, কিন্তু ইহকালের সমস্তই যে প্রকার বেবন্দোবস্ত দেখিতেছি তাহাতে এই কাফেরটাকে না মারিয়া যদি তাহার একটা বিলি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারি তাহাতে আপত্তি দেখিতেছি না।"

বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে চারটি মুসলমান চরিত্র আছে। হোসেন খাঁ, মুক্তিয়ার খাঁ, হোসেন খাঁর ভাই এবং আবদুল। এরা পাঠান এবং প্রতাপের একান্ত বিশ্বাসভাজন। হোসেনকে ঘাতকের ভূমিকায় দেখালেও সে প্রকৃত খুনী নয়, কবি ও প্রেমিক। মুক্তিয়ার খাঁ নির্দেশ-প্রাপ্ত সেনাপতি। প্রভুর আদেশ পালন তার কর্ম কিন্তু সে নিজ হাতে বসন্তকে হত্যা করতে পারেনি, আবদুলকে সেকাজে লাগিয়েছিল। যুবরাজ উদয়াদিত্য "মুক্তিয়ারের মুখে মমতার ভাব দেখিয়া রুদ্ধপ্রাণ খুলে দিয়েছিল।" মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই অনুভূতি মূল্যবান জীবনবোধ।

বসন্ত রায় হত্যা প্রসঙ্গটি *বউঠাকুরানীর হাট* গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করে নিয়েছেন প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি মুক্তিয়ার খাঁ মনিবের আদেশ পালনার্থে আবদুলকে দিয়ে এ-জঘন্য কাজটি সম্পন্ন করিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস ভিন্নকথা বলে, *শ্রীরাজমালা*-য় উল্লেখিত আছে প্রতাপ স্বহস্তে বসন্ত রায়ের মস্তক দেহচ্যুত করেন। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে ১৬০২খ্রী.।[২০] ঐতিহাসিকভাবে মুক্তিয়ার বা আবদুলের এ ঘটনায় কোন অবদান নেই। মানবরস সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মোহাবিষ্ট, ইতিহাস সৃষ্টির প্রয়োজন তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন।[২১]

তিন

বউঠাকুরানীর হাট ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে সমালোচকদের প্রশংসা পায়নি। তবে *রাজর্ষি* (১৮৮৭) সেদিক থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। সমালোচক বলেছেন এতে বঙ্কিমী রীতির প্রভাব থাকলেও শা-সুজার সঙ্গে রঘুপতির মিলন, নক্ষত্র রায় কর্তৃক যুদ্ধ যাত্রা, গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যত্যাগ, ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনায় ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টির নৈপণ্য আছে।[২২] *রাজর্ষি*-র

কাহিনীতে বাংলার ইতিহাস খানিকটা থাকলেও ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের ইতিকথাই এর আখ্যানভাগের মূল প্রতিপাদ্য।

রাজর্ষি উপন্যাস চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ-এ বিভক্ত—উনবিংশ পরিচ্ছেদ থেকে মুসলিম ইতিহাসের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং নক্ষত্রমাণিক্যের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ শুরু হলে রাজপুরোহিত রঘুপতি নক্ষত্রমাণিক্যের সঙ্গে যোগদান করে গোবিন্দ-মাণিক্যকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। 'প্রেমের অহিংস পুজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপুজার বিরোধ'[২৩] উপন্যাস কাহিনীর মূলতত্ত্ব। শিশু ধ্রুবকে বলিদানের নিমিত্তে নক্ষত্র ও রঘুপতি আয়োজন করেছিল, এই অপরাধে গোবিন্দমাণিক্য উভয়কেই আট বৎসরের নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন। বিক্ষুব্ধ প্রতিশোধকামী রাজপুরোহিত রঘুপতি কৌশলে শা-সুজার সঙ্গে যোগাযোগ করে। রবীন্দ্রনাথ এখানে মুঘল ইতিহাসের উত্তরাধিকার-সংগ্রাম এবং শাহজাহান-পুত্র শা-সুজা-জীবনের মর্মন্তুদ ঘটনাকে *রাজর্ষি* উপন্যাসের মূল আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। গ্রন্থের উনবিংশ পরিচ্ছেদে লেখক তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করেছেন এইভাবে:

> তখন মোগল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল। তখন তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব দক্ষিণা পথে বিজাপুর আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাংলার অধিপতি ছিলেন। রাজমহলে তাঁহার রাজধানী, কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্তা। জ্যেষ্ঠ যুবরাজ দারা রাজধানী দিল্লিতেই বাস করিতেছেন। সম্রাটের বয়স ৬৭ বৎসর। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া দারার উপরেই সাম্রাজ্যের ভার পড়িয়াছে।
> রঘুপতি...রাজমহলে যখন পৌছিলেন তখন ভারতবর্ষে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে শাহজাহান মৃত্যুশয্যায় শয়ান। এই সংবাদ পাইবামাত্র সুজা সৈন্যসহিত দিল্লি অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। সম্রাটের চারিপুত্রই মুমূর্ষু শাহজাহানের মাথার উপর হইতে মুকুটটা একেবারে ছোঁ মারিয়া উড়াইয়া লইবার উদযোগ করিতেছেন।... ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অরাজক রাজমহল ত্যাগ করিয়া সুজার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।[২৪]

সুজা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেছেন একথা জেনে দারা তৎপুত্র সুলায়মান-কে জয়সিংহের অধীনে বিপুল বাহিনীসহ প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রেরণ করেন। সুলায়মানের আগমন সংবাদ পেয়ে বিজয়গড়ের কেল্লা অধিকার করে সেখানে সৈন্য সমবেত করবার জন্য সুজা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বিজয়গড়ের অধিপতি বিক্রমসিংহকে কেল্লা এবং সরকারী খাজনা তাঁর নিকট সমর্পণের জন্য দূত প্রেরণ করলেন। বিক্রম জানালেন 'আমি কেবল দিল্লীশ্বর শাহ-জাহান এবং জগদীশ্বর ভবানীপতিকে জানি—সুজা কে? আমি তাহাকে জানিনা।'[২৫]

এখানে সুজার সেনাদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অরণ্যের মধ্যে সুজার শিবির ছিল, সুলায়মান এবং জয়সিংহের সৈন্য এসে সহসা তাকে বন্দী করে। সুজার সৈন্যরা কুড়িটা কামান পশ্চাতে ফেলে রণে ভঙ্গ দেয়। (পৃ.৪৩৩)। বিক্রমসিংহ সুলায়মানকে দুর্গে স্বাগত জানালেন। দিল্লীশ্বরের অশ্বগজে-সৈন্যে-সামন্তে কেল্লা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ রঘুপতির কৌশলে সুজা নিশাযোগে সুড়ঙ্গ-পথে পলায়ন করেন। পরাজয় ও পলায়নের পর সুজা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু রাজকোষে প্রচুর অর্থ ছিল না, প্রজাগণ ছিল করভারে পীড়িত। ইতোমধ্যে আওরঙ্গজেব দারাকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন, এ-সংবাদে সুজা সমূহ বিচলিত হলেন এবং কিছু সময় ক্ষেপণের জন্য আওরঙ্গজেবের নিকট এক দূত প্রেরণ করলেন এই সংবাদ দিয়ে যে, তাঁর সিংহাসন লাভে সুজা সবিশেষ খুসি হয়েছেন। এখন বাংলা শাসনের জন্য তাঁকে মঞ্জুরীপত্র দিলেই তাঁর আনন্দের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। আওরঙ্গজেব জানালেন স্বয়ং সম্রাট শাহজাহান যাকে নিয়োগ করেছেন তাঁর মঞ্জুরীপত্রের আবশ্যকতা নেই।

এদিকে পুরোহিত রঘুপতি নক্ষত্ররায়ের পক্ষ থেকে সুজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসাজস করেছে। গোবিন্দমাণিক্য-নক্ষত্রমাণিক্যের মধ্যে ঘোরতর ভ্রাতৃ-বিরোধ ঘটিয়ে সে গোবিন্দমাণিক্যকে নির্বাসিত করে নক্ষত্রকে রাজা করে ফায়দা লুঠতে চায়। আর এ-কাজে সে ব্যবহার করতে চায় সুজাকে। এ জন্য সুজাকে সে দেড় লক্ষ মুদ্রা নজর দেয়। যুদ্ধ ব্যয়স্বরূপ আরও ছত্রিশ হাজার টাকা রেখে গেল এবং নক্ষত্র রায় রাজা হওয়ামাত্র সেনাপতির হাতে এক বৎসরের অগ্রিম খাজনা পাঠিয়ে দেবার অঙ্গীকার করে। অতঃপর সুজা একদল মোগল সৈন্য তাদের সঙ্গে পাঠালেন। রঘুপতির প্রার্থনা অনুসারে গোবিন্দমাণিক্যের নির্বাসন এবং নক্ষত্র রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তির পরোয়ানাও তিনি মঞ্জুর করেছিলেন। কাহিনীর এই অংশটি রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-প্রসূত এবং অনৈতিহাসিক। যদি সুজা গোবিন্দমাণিক্যের নির্বাসন পরোয়ানা জারি করতেন তবে গোবিন্দমাণিক্য তাঁর কথা স্মরণ করে বেদনাপ্লুত হতেন না এবং তাঁর নামে মসজিদও নির্মাণ করতেন না।

নক্ষত্র রায় রাজ্য-লোভে বাদশাহী সৈন্য নিয়ে ত্রিপুরা আক্রমণ করতে এসেছে এ-খবর পেয়ে গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্রকে বিল্বন মারফত একটি চিঠি পাঠালেন, 'তাহার মধ্যে কিছু-মাত্র র্ভৎসনা ছিলনা। গোবিন্দমাণিক্য তাঁহাকে লজ্জা দিয়া একটি কথাও বলেন নাই। ভাইয়ের প্রতি লেশমাত্র অভিমান

করেন নাই। নক্ষত্র রায় যে সৈন্য-সামন্ত লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন সে কথার উল্লেখমাত্র করেন নাই'।[২৬]

সেই চিঠি পড়ে নক্ষত্র রায়ের মনে ভাবান্তর জেগেছিল। তিনি কেঁদেছিলেন অবিরল কিন্তু তখন তিনি ব্রাহ্মণ রঘুপতির কঠিন নিয়ন্ত্রণে, স্বাধীন সত্তা নেই। গোবিন্দমাণিক্য সংসার ত্যাগ করলেন, নক্ষত্র রায় ছত্র-মাণিক্য নাম ধারণ করে রাজপদ গ্রহণ করলেন। চট্টগ্রামের ময়ানি নদীতীরে গোবিন্দমাণিক্য কুটির বেঁধে বাস করতে লাগলেন।

রাজর্ষি উপন্যাসের ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদের উপকরণ স্টুয়ার্টকৃত *বাংলার ইতিহাস* থেকে সংগৃহীত। এখানে বলা হয়েছে সুজা তাঁর ভ্রাতা আওরঙ্গজেব-সৈন্য কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পলায়ন করছেন। এলাহাবাদের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে তিনি পলায়ন করেন। তিনি যেখানেই যান শত্রু-সৈন্যের ধূলিধ্বজা এবং অশ্বের ক্ষুরধ্বনি তাঁকে অনুসরণ করে। এমনিভাবে তিনি যখন পাটনায় উপস্থিত হলেন, সুজা পাটনা ছেড়ে মুঙ্গেরে পলায়ন করলেন। মহম্মদের সাহায্যের জন্য যখন মীরজুমলা বহু সংখ্যক সৈন্যসহ বসন্তপুরে উপস্থিত হলেন তখন সুজা মুঙ্গের ছেড়ে চলে গেছেন রাজমহলে। এ-যুদ্ধের আগে মহম্মদের সঙ্গে সুজা-তনয়ার বিবাহের সমস্ত স্থির হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তা' বিলম্বিত ও বিস্মৃত হয়েছে। রাজমহলের অনতিদুরে যখন মহম্মদ ও মীর জুমলা শিবিরে অবস্থান করছিলেন সেই সময় সুজা-তনয়া গোপনে মহম্মদের নিকট একখানি লিপি প্রেরণ করেন:

> কুমার, এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল? যাঁহাকে মনে মনে স্বামীরূপে বরণ করিয়া আমার সমগ্র হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি, যিনি অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি আজ নিষ্ঠুর তরবারি হস্তে আমার পিতার প্রাণ লইতে আসিয়াছেন এই কি আমাকে দেখিতে হইল! কুমার, এই কি আমাদের বিবাহ উৎসব! তাই কি এত সমারোহ! তাই কি আমাদের রাজমহল আজ রক্তবর্ণ! তাই কি কুমার দিল্লি হইতে লোহার শৃঙ্খল হাতে করিয়া আনিয়াছেন! এই কি প্রেমের শৃঙ্খল![২৭]

পত্রখানি ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের রচনা, কিন্তু এতে শাজাদীর প্রেমরঙিন বেদনাবিহ্বল কোমল হৃদয় বাস্তবরূপে উপস্থিত হয়েছে। এই পত্র পাবার পর শাহজাদা মহম্মদ যৌবনের দীপ্ত হুতাশনে ক্ষতিলাভের বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে পিতৃব্যের সঙ্গে যোগ দিলেন। সুজার প্রাসাদে আনন্দের হিল্লোল বইল কিন্তু হতভাগ্য সুজার মনে শান্তি এলনা। আওরঙ্গজেব নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন: তিনি মহম্মদকে লিখলেন—রমণীর ছলনায় মুগ্ধ হয়ে আপনধর্ম

বিসর্জন দিয়াছ। ভবিষ্যতে সমগ্র মোগল-সাম্রাজ্য শাসনের ভার যাহার হস্তে, তিনি আজ এক রমণীর দাস হইয়া আছেন! যাহা হউক, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া মহম্মদ যখন অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাহাকে মাফ করিলাম। কিন্তু যে কার্যের জন্য গিয়াছেন সেই কার্য সমাধা করিয়া আসিলে তবে তিনি আমাদের অনুগ্রহের অধিকারী হইবেন।'[২৮]

এ-পত্র পাঠ করে সুজা মহম্মদকে সন্দেহ করলেন এবং তার কোন কৈফিয়ত শুনলেন না—সদ্য বিবাহিত দম্পতিকে বিদায় দিলেন। মহম্মদ অশ্রু বিসর্জনপূর্বক সস্ত্রীক বিদায় হলেন। আওরঙ্গজেব চরিত্রের প্রতি লেখ-কের অঙ্গুলি নির্দেশ সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মোগল উপাদান ব্যবহার সমান্তরাল। মহম্মদকে বিদায় দিয়ে সুজা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি আর যুদ্ধ করবেন না, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে জাহাজযোগে গমন করবেন।

সমুদ্র-গতি অনুকূলে না থাকায় তৎক্ষণাৎ তা সম্ভব হয় না। এ-সময় নির্বাসিত গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ছদ্মবেশী সুজা স্বীকার করেন তিনিই তাঁকে নির্বাসনদানকারী শা-সুজা। সন্ন্যাসী গোবিন্দমাণিক্যের নিকট আত্মসমর্পণ করে মোগলরাজকুমার তত্ত্ববাক্য উচ্চারণ করলেন: 'মহারাজ, আর সকলেই অতি সহজেই ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে, কেবল নিজের ভাই করে না।'

প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সুজা মক্কা যাত্রা স্থগিত করে সপরিবারে আরাকান রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই তাঁর দুর্ভাগ্য ষোলকলায় পূর্ণ হয়। সম্ভবত মগরাজার হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। রবীন্দ্রনাথ সুজার বিষাদময় জীবন *রাজর্ষি* উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। সমকালে 'দালিয়া' গল্পেও তিনি এ ঘটনা বিবৃত করেছেন শিল্পীর মহান তুলিকায়।

এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে নবীন লেখক মোগল-উত্তরাধিকার, যুদ্ধের বিবরণ, বাংলার সমকালীন ইতিহাস, ত্রিপুরার ইতিহাস এবং সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। যদুনাথ সরকার, গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ, কৈলাশচন্দ্র সিংহ, স্টুয়ার্ট এ-সব লেখকের গ্রন্থাবলি তিনি আপন বক্তব্যের অনুকূলে ব্যবহার করেছেন। শাহ সুজা বাংলার শাসনকর্তা হয়ে আসেন ১৬৩৯ খ্রী.[২৯], আওরঙ্গজেব-সেনাপতি মীর জুমলা কর্তৃক বিতাড়িত সুজার শেষ পরিণতি রহস্যাচ্ছন্ন। তাঁর শেষ পরিকল্পনা সম্পর্কে স্টুয়ার্ট বলছেন:

> If this measure failed him, he still had the alternative of proceeding Aracan and of soliciting the protection of the prince of that country ... he crossed the river Brahmapooter, and having entered the wild mountains of Tipera, after a

long and wearisome journey, he reached Chittagong ... as the monsoon was raging with violence, no vessel could have attempted the voyage to Arabia at that season of the year.

He had now no option left but of proceeding to Aracan, or falling into the hands of his pursuess, ... he was met on the frontier by an officer from the prince (of Aracan) with assurance of his protection and friendship.[৩০]

অনেকদিন ভবঘুরে জীবন কাটানোর পর সুজা এবং তাঁর পরিবার আরাকান রাজের আশ্রয় পেলেন। তাঁকে আরাকান রাজের পক্ষ থেকে রাজকীয় আতিথ্য দান করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিনের মধ্যে আরাকান রাজের আচরণ বদলে গেল। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বলেছেন:

For sometime the conduct of the Raja was unexceptionable, but whether alarmed by the threats or won by the bribes of the Governor of Bengal, his behaviour suddenly changed; he became cold and reserved, and his servants no longer attended to the rites of hospitality. At length he sent Suja a verbal message, that he must either give him his daughter in marriage or immediately quit his kingdom.[৩১]

এ-ধরনের প্রস্তাব মোগল রাজকুমারের নিকট ছিল অসহনীয়। তিনি আরাকানরাজকে জবাব দিলেন তৈমুরের বংশধর অবমাননার নিকট মাথা নত করে না। মৌসুম পরিবর্তিত হওয়ামাত্র একটি জাহাজ পেলেই তিনি তার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন। তবে রাজার অবশ্যি জানা উচিত যে, বছরের এ-সময় তাঁর পক্ষে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। সুজার এহেন উত্তরে আরাকান-রাজ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করে—স্ত্রী ও কন্যাত্রয় চরম দুর্ভাগ্য বরণ করে ১৬৬১ খ্রি. আরাকানে মৃত্যু বরণ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন আরাকানপতি সুজার কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য আরাকানরাজের বিশ্বাসঘাতকতা, নৃশংসতা এবং সুজার দুর্ভাগ্য স্মরণ করে বেদনার্ত হৃদয়ে তাঁকে বারবার মনে করতেন।[৩২]

চার

রাজর্ষি উপন্যাসের ঊনবিংশ-বিংশতি পরিচ্ছেদে সৈন্যদের নির্মম আচরণের চিত্র অংকন করা হয়েছে। লেখক বলেছেন, 'পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যরা যে-পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে কেবল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে। সৈন্যরা অশ্ব ও হস্তীপালের জন্য অপক্ক শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। কৃষকের

মরাইয়ে একটি কণা অবশিষ্ট নাই। চারিদিকে কেবল লুণ্ঠনাবশিষ্ট বিশৃংখলা। অধিকংশ লোক গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়াছে। তাহারা চকিত হরিণের নায় সতর্ক'। সৈন্যদের এই আচরণ সম্ভবত কবির অভিজ্ঞতার ফল। মুঘল সৈন্য, ইংরেজ সৈন্য, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগের সৈন্য এমন আলাদা কোন ব্যাপার নয়। সকল যুগের, সকল দেশের সৈন্যই একরূপ আচরণ করে থাকে। মুঘল সৈন্যরা নক্ষত্র রায়কে বলেছেন 'লড়াইয়ে যাইবার পথে আমরা গ্রাম লুঠ করিয়া যাই—কোনো শাস্ত্রে ইহাতে দোষ লিখেনা'। (র-র-২, পৃ. ৪৫৮)। তাই রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের প্রতি বিমুখ ছিলেন।গোবিন্দমাণিক্য যুদ্ধ ও স্বার্থ ত্যাগ করে রাজ্য-রাজপাট ছেড়ে সন্ন্যাসী'র মত জীবন-যাপন করেন। অবশ্যি রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাসের প্রতি সমর্থন দেননি, সন্ন্যাসীদের তিনি মাঝে মাঝেই বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে আদর্শ পুরুষগণ মূলত কর্মযোগী। স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসীরা দৈবশক্তি সম্পন্ন।

রাজর্ষি-র বিল্বন একটি মহাপুরুষ চরিত্র—সে কোন্ দেশের লোক তা কেউ জানেনা; ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপবীত ত্যাগ করেছে। তার ব্রত 'রাজ্য সেবা', 'রাজসেবা' নয়।[৩৩] বঙ্কিমের অভিরাম স্বামী *(দুর্গেশনন্দিনী)* বা রামানন্দস্বামী *(চন্দ্রশেখর)*-র মত সে রহস্যাশ্রয়ী নয়। সে বলিদান বন্ধ করে নতুন ধরনে দেবী পূজা করে। লেখক বলেছেন, 'তিনি বাড়িবাড়ি গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সংবাদ লন এবং রোগীকে যাহা ঔষধ দেন তাহা আশ্চর্য খাটিয়া যায়।' (র-র-২,পৃ.৪৫৪)।

মহামারী মড়ক দুর্ভিক্ষে বিল্বন মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে। গ্রন্থের এক-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে আছে : 'পাঠানদের পাড়ায় মড়কের প্রথম আরম্ভ হইল। মৃতদেহের গোর দিবার বা পরস্পরকে সেবা করিবার অবসর কাহারো রহিল না। হিন্দুরা কহিল, মুসলমানেরা গো-হত্যা পাপের ফল ভোগ করিতেছে। জাতি বৈরিতায় বা জাতিচ্যুতি ভয়ে কোনো হিন্দু তাহাদিগকে জল দিলনা বা কোনো প্রকার সাহায্য করিল না।—তিনি পীড়িত পাঠান-দিগকে সেবা করিতে লাগিলেন—তাহাদিগকে পথ্য পানীয় ঔষধ এবং তাহাদের মৃতদেহ গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। বিল্বন কহিতেন, 'আমি সন্ন্যাসী আমার কোনো জাত নেই। আমার জাত মানুষ।'[৩৪]

স্রষ্টার সৃষ্ট বিপদগ্রস্ত মানুষের সেবাই বিল্বনের ব্রত। মানুষ মরলে জাত কিসের? তাকে বাঁচানোই সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তার অনাসক্ত পরহিতৈষণা এবং মানবপ্রেম রবীন্দ্রনাথেরই অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেম। বিল্বনের সেবা ও

প্রেমমুগ্ধতায় মুমূর্ষু পাঠানেরা তাকে দেবতাজ্ঞান করতে লাগল। সমকালের সন্ন্যাসী *আনন্দমঠ*-এর মহাপুরুষগণের কার্যকলাপ যখন জাত্যভিমান ও জাতিবিদ্বেষে কলঙ্কিত সেই সময়ের এক নবীন লেখকের বাণী সর্বকালের পাঠককে, নির্যাতিত মানুষকে করবে মোহিত, কৃতজ্ঞ।

সন্ন্যাসী বিল্বন মড়কজীর্ণ পাঠানদের ছোটো ছোটো ছেলেদের বাঁচানোর জন্য হিন্দুদের কাছে নিয়ে গেলে 'কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় দিল না'। তখন 'বিল্বন একটা বড়ো পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার ছেলের পাল সেইখানে রাখিলেন। প্রাতে উঠিয়া বিল্বন ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু ভিক্ষা কে দিবে?...মাঝে মাঝে বিল্বন ছেলেদের সঙ্গে গিয়া খেলা করিতেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিলে কোলাহল উত্থাপন করিত—সন্ধ্যার সময় মন্দিরের পাশ দিয়া গেলে মনে হইত যেন মন্দিরে সহস্র টিয়াপাখি বাসা করিয়াছে।'[৩৫]

অসহায় মানব-সন্তানের প্রতি এই যত্ন এবং প্রেম সর্বকালের মানবপ্রেমীর এক বিরল দৃষ্টান্ত। সেদিনের একদল সন্ন্যাসী সন্তান নিরীহ বিজাতিদের বস্তি পুড়িয়েছিল, তার শতবর্ষ পরে সভ্যতার অভিমান-রঙিন মধ্যাহ্নেও যুদ্ধাগুনে পুড়েছে অগণিত শিশু-মনোহর। যারা অজস্র টিয়াপাখিকে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে বিনাশ করছে তারা তা করছে কোন্ ধর্মের আহ্বানে? রবীন্দ্রনাথের সন্ন্যাসী ভিন্ধর্মের শিশুর ক্ষুধা নিবারণে ভিক্ষা করছে—মানবকল্যাণের এ-উদাহরণ বিস্মৃত হওয়া পাপ।

অসহায় মানব-সন্তানকে ক্ষুধায় আহার দেবার আহ্বানে, বিপদে আশ্রয় দানের প্রার্থনায় যখন হিন্দুরা বিষম শশব্যস্ত হয়ে অস্বীকৃতি জানালো তখন ভগবানের মন্দির তাদের তাড়িয়ে দেয়নি। দূর গ্রামের মুসলমান জমিদারের নিকট থেকে বিল্বন সাহায্য নিয়ে ঢাকা থেকে চাউল আমদানি করে পাঠান-বাচ্চাদের ক্ষুধার অন্ন যুগিয়েছেন। সকল পীড়িত মানুষের সেবা করেছেন, তাদের মাঝে চাউল বিতরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ *রাজর্ষি*-তে *আনন্দমঠ*-এর এক বিপরীত চিত্র উপস্থিত করেছেন: অবশেষে মড়ক মুসলমান পাড়া থেকে হিন্দুপাড়ায় বিস্তার লাভ করল।—

> গ্রামে একপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইল— চুরি, ডাকাতির শেষ নাই, যে যাহা পায় লুঠ করিয়া লয়। মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া ডাকাতি আরম্ভ করিল। তাহারা পীড়িতদিগকে শয্যা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাদুর বিছানা পর্যন্ত হরণ করিয়া লইয়া যাইত।[৩৬]

এই বিশৃংখলা এবং অরাজকতা দূর করবার জন্য বিল্বন যথাসাধ্য চেষ্টা করে গ্রামে শান্তি এনেছিলেন। বিল্বনের কথা কেউ অমান্য করত না। আলোচ্য মহামারী ও দুর্ভিক্ষ ১২৭৬-এর মন্বন্তরের ছায়া। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন যে মড়কের সময় 'অরাজকতা'[৩৭] উপস্থিত হয়েছে। এই 'অরাজকতা'-র কারণে অবাধ চুরি-ডাকাতি হয়েছে, মুসলমান দল বেঁধে হিন্দুর বাড়ি-ঘর লুঠ করেছে। একই ঘটনা *আনন্দমঠে* চিত্রিত হয়েছে: স্বামী সত্যানন্দের প্রেরণায় সন্তানসেনারা যবনদের বস্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাদের পিপীলিকার মত দলে মেরেছে। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা চিত্রণের দায় রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের হলেও মূল জিজ্ঞাসা সেটা নয়—তা'এই যে কেন হিন্দুরা দল বেঁধে মুসলমান বস্তি জ্বালায়, কেনই বা মুসলমান দল বেঁধে হিন্দুর বাড়ি-ঘর লুঠ করে? এর উত্তর প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি। বর্গীর আক্রমণ, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইয়োরোপীয়দের প্রাধান্য, নবাবের অযোগ্যতা, সামন্ত-স্বৈরাচার বৃদ্ধি প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশে দারুণ অরাজকতা দেখা দেয়।[৩৮] *আনন্দমঠ* উপন্যাসে কালোনৌচিত্য দোষ ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথও কালের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেননি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বালাদেশে সুষ্ঠু প্রশাসন সম্ভব ছিলনা। তারপর উত্তরাধিকার-সংগ্রামের ফলে সারা ভারতে প্রশাসনিক বিশৃংখলা বিরাজ করছিল। সংক্ষিপ্ত হলেও *রাজর্ষি*-সংশ্লিষ্ট ঘটনা *আনন্দমঠে*-র জবাব।

মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালবাসা একান্তই ব্যক্তিক। একান্তই স্বীয় হৃদয়ের মাধুর্য-বশ। শিশুর প্রতি তাঁর দরদ আন্তরিক এবং সারা জীবনের অক্ষয় আদর্শ। *রাজর্ষি*-র ধ্রুব এবং আশ্রিত মুসলমান শিশুদের বর্ণনা অসাধারণ প্রাণস্পর্শী। *রাজর্ষি* উপন্যাসের রাজর্ষি হলেন ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য। তাঁর রাজত্বকাল আরম্ভ হয় ১৬৩০ খ্রি।[৩৯] তিনি ছিলেন 'জীববলি' বিরোধী। রাজপুরোহিত রঘুপতি এই কারণে রাজার প্রতি বিক্ষুব্ধ হন।—সভাসদেরা বলাবলি করিতে লাগিত, "এ যে মগের মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইল। আমরা তো জানি বৌদ্ধ মগেরাই রক্তপাত করেনা, অবশেষে আমাদের হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে না কি?'[৪০]

মহারাজার ভাই নক্ষত্র রায়ও সভাসদগণের সঙ্গে একমত হলেন। রঘুপতি তাঁকে বশে আনলেন। তাঁকে বললেন, 'মায়ের ইচ্ছা, তিনি রাজরক্ত দর্শন করিবেন। তুমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত দেখাইয়া তার ইচ্ছা পূরণ করিবে, এই আমার আদেশ।' নক্ষত্র রায় জবাব দিলেন, 'আমি আজই গিয়া ফতে খাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করিব।' এই বক্তব্য *বউঠাকুরানীর হাট* উপন্যাসের মুক্তিয়ার খাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রক্তপাতের প্রয়োজন

হলেই খাঁ সাহেবদের ডাক পড়ে! রঘুপতির ষড়যন্ত্র নক্ষত্র মহারাজার নিকট স্বীকার করে। তাতে ষড়যন্ত্রের শেষ হয়নি। ধ্রুবকে দেবীর সম্মুখে বলিদানের চেষ্টা থেকে উদ্ধার করে মহারাজা রঘুপতি ও নক্ষত্র রায়ের বিচার করে উভয়কে জীববলির দায়ে আট বৎসরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিলেন। নির্বাসনকালে রঘুপতি সুজার সঙ্গে যোগসাজস করলেন। মহারাজার নিকট থেকে আদায়কৃত দু'লক্ষ টাকার প্রায় সবই সুজাকে নজর দিয়ে নক্ষত্র রায়কে ত্রিপুরার রাজা করবার এবং গোবিন্দমাণিক্যকে নির্বাসনের পরোয়ানা জারি করে মহারাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য আদেশ ও সৈন্য লাভ করলেন। উত্তরাধিকার-যুদ্ধে বিপর্যস্ত সুজা ধূর্ত ব্রাহ্মণের কথায় সম্মত হলেন। মোগল সৈন্য নিয়ে নক্ষত্র রায় ত্রিপুরাভিমুখে অগ্রসর হবার সংবাদ পেয়ে নির্বিরোধ, অহিংস, ন্যায়াধীশ গোবিন্দমাণিক্য পত্র মারফত তাঁকে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু রঘুপতির পরামর্শে নক্ষত্র তা না করে সসৈন্যে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। গোবিন্দমাণিক্য পশ্চিম দ্বার দিয়ে বেরিয়ে গেলেন স্বেচ্ছা-নির্বাসনে। তিনি যে দুর্গে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে ছিলেন সুজা সেখানে উপস্থিত হলেন তিন কন্যাসহ ফকির ছদ্মবেশে। তিনি রাজাকে বললেন, 'আমিও তোমার শত্রু, আমিও তোমার হাতে ধরা দিলাম।' রাজা ও নবাব কোলাকুলি করলেন। যে সুজা রাজাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন তাঁকেই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এবং আরাকান রাজের বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত সুজাকে স্মরণ করে তিনি দুঃখ করতেন। তাঁর স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লায় সুজা-মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তিনি অনেক সৎকার্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর অহিংস স্বভাব ও পরোপকারী আদর্শের জন্য তাঁকে যথার্থই রাজর্ষি বলা যায়। একজন হিন্দু রাজার পক্ষে নির্বাসনদাতা মুসলমানকে এমন বন্ধু বলে গ্রহণ করা এবং তাঁর স্মৃতিকে অক্ষয় করবার প্রয়াস বিরল দৃষ্টান্ত।

বউঠাকুরানীর হাট ও *রাজর্ষি* উপন্যাসে ইতিহাসের যে উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে তা ইতিহাস-অনুগত হোক অথবা না-হোক এখানকার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'মানুষের-ধর্ম' ভাবনার পূর্ব-প্রস্তুতি[৪০]। পরবর্তী *গোরা* উপন্যাসে তার বিস্তৃততর পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে ধরনের মুসলিম-বিদ্বেষ লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে তা নেই। আলোচ্য উপন্যাস দু'টিতে দেখা যায় মুঘলদের প্রতি তিনি রুষ্ট হলেও পাঠানদের প্রতি তিনি তেমন ক্ষুব্ধ নন।

তিনি ভেবেছিলেন পাঠানরা বাংলাদেশের মানুষ। খুন-খারাবীতে পাঠানদের যে ভূমিকা তা আসলে প্রতাপাদিত্যের মত রাজাদের আদেশের ফল। কোন পাঠান নিজ গরজ বা স্বভাবে খুন করেনি।

ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ বা হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচার এখানে নেই। সত্য অর্থে দেশকাল-মানব পরিচয় উপস্থাপন রচনা দুটির মূল আবেদন। বঙ্কিমী বাতাবরণের প্রতিক্রিয়ার যুগে রচিত উপন্যাসদ্বয়ে ত্রিশূল গৌরব ঘোষিত হয়নি, এখানে মুক্তমতি দেশপ্রাণতার আদর্শ হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল।[৪১]

তথ্যনির্দেশ

১ *ভারতী* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে ১২৮৯-এর আশ্বিন সংখ্যায় এক বছর ধরে *বউঠাকুরানীর হাট* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮০৪ শকের পৌষ মাসে/ ১৮৮৩ খ্রি. জানুয়ারি মাসে।

২ *বালক* পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত *রাজর্ষি*-র ২৬টি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হয় এবং পরে অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ গুলো রচিত হয় এবং গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১২৯৩ সালের মাঘ মাসে।

৩ Kshetra Gupta, *Novels of Tagore: Structures and Variations*, Calcutta, 1991, p.8.

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছেলেবেলা*, বি. ভা. পু. মু. ১৩৭৫, পৃ. ৪৭

৫ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃ.খ. তৃ.স. কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ.৩৪৭

৬ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, বি. ভা. ১৩৭৭, পৃ. ১৫৫

৭ তদেব, পৃ. ১৫৫

৮ তদেব, পৃ. ১৫৪

৯ তদেব, পৃ. ১৫৪

১০ কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত *শ্রীরাজমালা*, তৃতীয় লহর দ্র.

১১ পূর্বোক্ত, *রবীন্দ্র জীবনী*, পৃ. (পাদটীকা) ১৫২

১২ James Wise, '*On the Barah Bhuiyas of East Bengal*'. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*. Vol. XLIII, part I. No. I-IV, Calcutta, 1874.

১৩ ভূদেব চৌধুরী, *রবীন্দ্র-উপন্যাস: ইতিহাসের প্রেক্ষিতে*, ১ম সং, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২৩

১৪ *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ১ম খণ্ড, বি. ভা. ১৩৯০, পৃ. ভূমিকা।

১৫ পূর্বোক্ত, *রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ. ১৫৫

১৬ *রবীন্দ্ররচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬

১৭ তদেব, পৃ. ৩৮২

১৮ তদেব, পৃ. ৪৮০

১৯ উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত, *রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ. ১৫৫

২০ পূর্বোক্ত, *শ্রীরাজমালা*, পৃ. ২৮৯

২১ সত্যব্রত দে, *রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা*, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১০৫

২২ তদেব, পৃ. ১৪৫

২৩ সূচনা, *রাজর্ষি*, ১৮৮৭

২৪ *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ২য় খণ্ড, বি. ভা, ১৩৮১, পৃ. ৪২৫

২৫ তদেব, পৃ. ১৩৮১, পৃ. ৪২৮

২৬ তদেব, পৃ. ৪৬৭

২৭ তদেব, পৃ. ৪৯২

২৮ তদেব, পৃ. ৪৯৪

২৯ Jadunath Sarker, *The History of Bengal*. Vol. II. Dhaka, 1972. Pp. 229-30.

৩০ Charles Stwart. *History of Bengal*. Bangabasi edn.. 1910. Pp. 306-07

৩১ Ibid., p. 308

৩২ মহিমচন্দ্র ঠাকুর, 'কুমিল্লার সুজা মসজিদ', *প্রবাসী*, ফাল্গুন, ১৩২৯, পৃ. ৬৫৯

৩৩ *রবীন্দ্রজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃ.২২৩

৩৪ *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ.৪৮৩

৩৫ তদেব, পৃ.৪৮৩

৩৬ তদেব, পৃ.৪৮৩-৮৪

৩৭ তদেব, পৃ.৪২৮

৩৮ আহমদ শরীফ, 'বঙ্কিম-বীক্ষা: অন্য নিরিখে', *ভাষাসাহিত্যপত্র*, তৃতীয় বর্ষ, ১৩৮২, পৃ.৫৭-৫৮

৩৯ *শ্রীরাজমালা*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৯

৪০ পূর্বোক্ত, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, পৃ.৩৮২

৪১ রবীন্দ্র গুপ্ত, *উপন্যাসে বাস্তবতা: রবীন্দ্রনাথ*, প্র. প্র. কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ.২১